Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ধর্মীয় সহাবস্থান ও অন্তঃধর্মীয় সংলাপ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাছুমা

রোলঃ 23090120318

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে ধর্মীয় সহাবস্থান ও অন্তঃধর্মীয় সংলাপ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাছুমা

রোলঃ 23090120318

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে ধর্মীয় সহাবস্থান ও অন্তঃধর্মীয় সংলাপ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাছুমা, আইডিঃ 23090120318 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে ধর্মীয় সহাবস্থান ও অন্তঃধর্মীয় সংলাপ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাছুমা

(স্বাক্ষর)

মাছুমা

আইডিঃ 23090120318

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ 5
ধর্মীয় সহাবস্থান 5
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ 6
মূলনীতি ও উদাহরণ 7
অন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব 7
আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পদ্ধতি 7
অন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব 8
যেমন ছিল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 9
অন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য ॥ 12
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও বিশ্বশান্তির পথ 24
উপসংহার 26

•

ভূমিকাঃ

ইসলামে ধর্মীয় সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ একে অপরের পরিপূরক, যেখানে সহাবস্থান হলো বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে বোঝায়, আর আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়া। ইসলামের মূলনীতি হলো নিজের ধর্ম এবং অন্যদের ধর্মকে সম্মান করা, যা মদিনা সনদ এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

যেমন " لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

‘তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।’

—আল কাফিরুন - ৬

ইসলামে ধর্মীয় সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ওপর জোর দেয়। ইসলামে এই নীতির মূলে রয়েছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা এবং একে অপরের উপাস্যকে গালি না দেওয়ার নির্দেশ, যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। এটি একটি শান্তিপূর্ণ ও বিবাদমুক্ত সমাজ তৈরির ভিত্তি স্থাপন করে।

ধর্মীয় সহাবস্থান

- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান:

ইসলাম জোর দেয় যে সমাজের সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

- অমুসলিমদের অধিকার:

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা বা তাদের উপাসনালয়কে অসম্মান করা যাবে না, যা সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ: মদিনার সনদ হলো এর একটি অন্যতম উদাহরণ, যেখানে মুসলিম, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।

•

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

লক্ষ্য: এর প্রধান লক্ষ্য হলো বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, শ্রদ্ধা, এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

পদ্ধতি: এটি ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় স্তরেই সহযোগিতামূলক এবং ইতিবাচক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

গুরুত্ব: এটি সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
কুরআনের শিক্ষা
কুরআনের সূরা কাফিরুন-এর এই আয়াতটি لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ
‘তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।’
ধর্মীয় সহাবস্থান ও সহনশীলতার একটি মৌলিক নীতি হিসেবে কাজ করে।
কুরআনে বলা হয়েছে,
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ
আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না।
(সূরা আন'আম-১০৮)

যা অন্য ধর্মের উপাসকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ।

মূলনীতি ও উদাহরণ

- পারস্পরিক শ্রদ্ধা:

ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সম্মান জানাতে শেখায়। কাউকে আঘাত বা অপমান করা যাবে না, এমনকি তারা যা পূজা করে তাও নয় (সূরা আন'আম: ১০৮)।

- সহাবস্থানের নীতি:

সূরা কাফিরুনে প্রত্যেককে তার নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যা ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করে।

- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান:

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ওপর জোর দেয় এবং সমাজের সকল ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে উৎসাহিত করে।

-

অন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব

বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধি, সামাজিক ঐক্য, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং মানবিক সহাবস্থানের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অপরিহার্য।

সম্প্রীতি ও ঐক্য:

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং আলেমদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরে।

-

আন্তঃধর্মীয় সংলাপের পদ্ধতি

সংলাপের বিভিন্ন রূপ:

আন্তঃধর্মীয় সংলাপে পারস্পরিক বোঝাপড়া, জ্ঞানার্জন, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অংশীদারিত্বের মতো বিভিন্ন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

সহযোগিতা:

সাধারণ কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং সাধারণ উদ্বেগগুলোর ওপর।

•

অন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামের মধ্যেই রয়েছে শান্তি ও আত্মসমর্পণের অর্থ। ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতার একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা কুরআনের বহু আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে।
'লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন।' (সূরা কাফিরুন: ৬) অর্থ: 'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম।'
এই আয়াত ইসলামের ধর্মীয় সহনশীলতার ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় একটি বহুধর্মীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মদিনা সনদ একটি যুগান্তকারী দলিল, যার মাধ্যমে মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের ভিত্তি রচনা করেছিল।
বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আমাদের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এই দেশে ইসলাম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা দীর্ঘকাল ধরে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির পরিবেশে বসবাস করছে।
ঢাকায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এই আন্তঃধর্মীয় সংলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অনুষ্ঠানে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বরা অংশ নিয়ে আলোচনা করেছেন ধর্মীয় সহাবস্থান ও সমাজে ধর্মীয় নেতাদের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে। এই সংলাপে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল, ধর্মীয় নেতারা কীভাবে উগ্রতা দমনে ভূমিকা রাখতে পারেন, কীভাবে তাঁরা তরুণ সমাজকে মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন এবং কীভাবে ধর্মকে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সম্প্রীতির বাহনে রূপান্তর করা যায়।
ধর্মীয় সম্প্রীতির সবচেয়ে শক্তিশালী বাহক হলো তরুণ প্রজন্ম। বাংলাদেশের শিক্ষিত, প্রযুক্তিপ্রবণ ও সৃজনশীল যুবসমাজ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বিভাজনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। তাদের মাঝে আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে আন্তঃধর্মীয় কর্মশালা, নাটক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সেমিনার আয়োজন করা যেতে পারে। পাঠ্যপুস্তকে সম্প্রীতির ইতিবাচক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ধর্মীয় বিষয়গুলো যেন বিদ্বেষের নয়, মানবতার শিক্ষা দেয়, এটা নিশ্চিত করতে হবে।
গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্ব গণমাধ্যম একটি সমাজের দর্পণ। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও সম্প্রীতির পক্ষে গণমাধ্যমকে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। নিউজ রিপোর্ট, টকশো, ডকুমেন্টারি এবং ব্যক্তিগত গল্পÑ সব মাধ্যমেই সহনশীলতা ও পমানবিকতার বার্তা ছড়াতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে গুজব, উস্কানিমূলক বক্তব্য ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে

সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। তরুণরা যেন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ইতিবাচক বার্তা প্রচার করে, এ জন্য প্রশিক্ষণ ও কনটেন্ট ক্রিয়েশন কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন।
এ ব্যাপারে কিছু জরুরি কর্মপরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে।
যেমন:
১. ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ,
২. পাঠ্যক্রমে সম্প্রীতির অন্তর্ভুক্তি,
৩. সম্প্রীতির সামাজিক আন্দোলন, আইনের প্রয়োগ এবং
৪. মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার।

•

যেমন ছিল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রচার ও সম্প্রসারণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তার এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি দাওয়াতের বার্তা পৌঁছানো, মানবতার মুক্তির বার্তা প্রচার এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো।
চিঠিপত্র প্রেরণ : রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এই চিঠিগুলোতে ইসলামের মূল শিক্ষা ও শান্তির বার্তা তুলে ধরা হতো। উল্লেখযোগ্য চিঠি প্রাপকদের মধ্যে একজন ছিলেন রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরাক্লিয়াসকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠান। হেরাক্লিয়াস এই চিঠিটি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। আর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে পারস্য সম্রাটের কাছে যখন চিঠি পাঠান, তখন খসরু এর প্রতি নাখোশ ছিলেন এবং চিঠি ছিঁড়ে ফেলেন। এছাড়া মিসরের সম্রাট মুকাওকিস রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চিঠির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপহার পাঠান।
শান্তিপূর্ণ চুক্তি : রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্র ও দেশের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিলেন, যার অন্যতম উদাহরণ হলো হুদায়বিয়ার চুক্তি। মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে এই চুক্তিটি করে তিনি মক্কা বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হন এবং এটি ইসলাম প্রচারের জন্য একটি কৌশলগত বিজয় ছিল।

প্রতিনিধিদল প্রেরণ : রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে তার সাহাবিদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তারা ইসলাম প্রচার করতে পারেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করতে পারেন।

প্রতিবেশী দেশের প্রতি দায়িত্বশীলতা : রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতেন এবং তিনি কখনোই আগ্রাসন বা শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেননি। বরং শান্তি ও কল্যাণের বার্তা দিয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন করতেন।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন। তিনি কখনো জোর করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেননি, বরং মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সম্মান করতেন।

মানবিক সাহায্য : রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে নয়, বরং মানবতার খাতিরে বিভিন্ন গোত্র ও জাতিকে সাহায্য করতেন। দুর্ভিক্ষ বা সংকটে পড়া জাতিগোষ্ঠীগুলোর প্রতি তার সহানুভূতি ও সাহায্যের হাত বাড়ানো ছিল মুসলিম জাতির জন্য একটি উদাহরণ। এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সহানুভূতিশীল ও উদার চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছিল।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান :

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে তুলতে অনেক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মদিনায় ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি মদিনা সনদ নামক চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মদিনা শহরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি নিশ্চিত করেছিল। এটি ছিল সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সংবিধানের একটি উদাহরণ।

আদর্শ কূটনীতিকের উদাহরণ :

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমগ্র জীবনে অন্য জাতির সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা, বিনয় ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি নিজে কখনোই উগ্রতা বা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেননি। তার আদর্শ কূটনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি ইসলামি দাওয়াতের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা তার আন্তরিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়ন :

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কেও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন, যা মুসলিম অর্থনীতির উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ইসলামপূর্ব যুগে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এবং রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সম্পর্ককে আরও সুসংহত করেছিলেন। ব্যবসার মাধ্যমে ইসলামিক নৈতিকতা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল।

উদার ধর্মীয় দর্শন :

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য ধর্মের প্রতি উদার ও সহিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করতেন। কখনোই কোনো জাতি বা ধর্মের ওপর জোর খাটিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। তিনি সব সময় মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজ করেছেন। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং তার কূটনৈতিক দক্ষতা নিয়ে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে, যা তার নেতৃত্ব, দাওয়াত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর আলোকপাত করে। আরও কিছু বিষয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো।

ইসলামিক দাওয়াতের বৈশ্বিক প্রসার :

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মানুষের কাছে আল্লাহর বার্তা পৌঁছানোর জন্য। তাই তিনি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থেকে বাইরের দেশগুলোতেও ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এটি ছিল তার প্রচেষ্টা যাতে সব মানুষ আল্লাহর একত্ববাদ এবং শান্তির দাওয়াত সম্পর্কে জানতে পারে। এই উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিলেন, যারা ইসলামিক শিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রচার করতেন।

ধর্মীয় বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা :

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে সম্মান করা। তার সময়ে মদিনা ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনস্থল। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেষ্টা করেছিলেন। তার এই আদর্শ বর্তমান যুগে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

দূতের প্রতি আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল আচরণ :

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য দেশ থেকে আগত দূত ও প্রতিনিধিদের প্রতি সর্বদা আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি তাদের সঙ্গে যথেষ্ট সম্মান ও আতিথেয়তার আচরণ করতেন, যা তার ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শমানের পরিচায়ক। যেসব প্রতিনিধি বা দূত ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন, তাদের সঙ্গেও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ করতেন না।

আন্তঃগোত্রীয় শান্তিচুক্তির গুরুত্ব :

রাসুল (সা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে গোত্রীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তিচুক্তি অপরিহার্য। এ কারণে তিনি কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিলেন। যেমন হুদায়বিয়ার চুক্তি মুসলমানদের এবং কুরাইশদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শান্তিচুক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। এই চুক্তি ইসলামের দাওয়াত প্রচারে আরও বড় ভূমিকা রাখে। কারণ মুসলমানরা তখন ইসলামের মূল বাণীকে আরও বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়।

সামরিক কৌশল ও আত্মরক্ষা :

রাসুল (সা.) কখনো অকারণে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেননি, বরং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কৌশলগত উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যেমন তিনি তাবুক অভিযানের সময় শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যেন মুসলমানদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন না হয়। তার এই সামরিক কৌশলগত সম্পর্ক স্থাপনের উদাহরণ বর্তমান যুগেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানবাধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা :

রাসুল (সা.) সব মানুষের জন্য সমান অধিকার ও মর্যাদার কথা বলতেন। তার কূটনৈতিক কার্যক্রমেও এটি প্রতিফলিত হয়। তিনি রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে চিঠিতে স্পষ্ট করে বলতেন যে, ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, বরং এটি মানবতার জন্য শান্তি ও সাম্যের বার্তা। রাসুল (সা.) এমন এক সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন যেখানে সব মানুষের মর্যাদা ও সম্মান সমান হবে।

আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান :

রাসুল (সা.) বিশ্বাস করতেন যে আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। যুদ্ধ বা সংঘর্ষ এড়িয়ে রাসুল (সা.) যতটা সম্ভব আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতেন। এটি ছিল তার কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ :

রাসুল (সা.) বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে সংলাপ ও আলোচনায় বিশ্বাস করতেন। খ্রিস্টান ও ইহুদি প্রতিনিধিদলকে তিনি মদিনায় অভ্যর্থনা জানাতেন এবং তাদের সঙ্গে ইসলামের মূল শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তার এই সহনশীলতা ও আন্তরিকতার কারণে অন্য ধর্মের মানুষও তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তাকে একজন মহান নেতার মর্যাদা দিয়েছেন।

•

অন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য ॥

ধর্মীয় ঐক্যের ভুল ব্যবহার অন্যায়

আমাদের দেশের বর্তমান হালত খুবই নাযুক। ভেতর ও বাহির থেকে দেশের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্র চলছে। দেশের হেফাজত, দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য চেষ্টা-মেহনত এবং এদেশের সীমানা সংরক্ষণ— এসব কেবল রাষ্ট্রীয় বিষয় নয়; বরং ঈমানী দায়িত্ব। কারণ দেশ যদি অস্থিতিশীল হয়, দেশে যদি নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে আমার আমল-ইবাদত, মসজিদ-মাদরাসা, জাগতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান সবকিছু অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে।

আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার জন্যও তো আমার নিরাপত্তা প্রয়োজন। এজন্য দেশের হেফাজত ঈমানী দায়িত্ব। এটি কোনোভাবেই কেবল রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয় নয়। কারণ এই দেশ সকলের নিকট আমানত। একটা মুসলিম ভূখণ্ড আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং আমানত। কাজেই তার হেফাজতও ঈমানী দায়িত্ব।

এই নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্য অনেক ধরনের ষড়যন্ত্র চলে।

ষড়যন্ত্রের একটি ধরন

মুসলিম দেশে অনেক অমুসলিম নাগরিকও বসবাস করে থাকে। তাদেরকে বিভিন্নভাবে উসকে দেওয়া হয়। তাদের কাউকে ব্যবহার করে বা অন্য কাউকে ব্যবহার করে অমুসলিমদের কোনো উপাসনালয়ে একটা সমস্যা ঘটিয়ে দেওয়া হল। কারো ঘর-বাড়িতে একটা ঝামেলা তৈরি করে দেওয়া হল। তারপর ব্যস, মিডিয়া তো আছেই; তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার শুরু করে দিল। ফলে পরিবেশ-পরিস্থিতি হয়ে গেল উত্তপ্ত!

পেশাদারত্বের গুণ আছে, এমন মিডিয়া আমাদের দেশে কয়টা আছে, আল্লাহ্ই ভালো জানেন! পেশাদারত্ব না থাকা তো এক অপরাধ। এর চেয়ে বড় অপরাধ এদের অনেকেই দেশ ও মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি করার জন্য লেগে থাকে। সবার কথা বলছি না; বরং এদের অনেকেই দেশ ও মুসলিম উম্মাহর শত্রু। এরা সবসময় উসকানি আর অপপ্রচারে লিপ্ত থাকে। এদের কাজই তথ্যসন্ত্রাস করা। তথ্যের বিকৃতি করে দেশের পরিবেশ নষ্ট করা। খামোখা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আর শত্রু দেশগুলোর কাজ হল, এসবকে সুযোগ হিসেবে লুফে নেওয়া।

এক্ষেত্রে কেবল মুসলিমদের সকল দল, মত, ফিরকা ও ঘরানার এক হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং দেশে যত ধর্মের লোক বসবাস করে, সবারই এক হওয়া উচিত। তবে সেটা কোন্ ইস্যুতে? দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইস্যুতে। দেশে যেন কেউ কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে— সেই ইস্যুতে। এই ইস্যুগুলোতে সকল ধর্মের নাগরিকদের এক হওয়া জরুরি।

হিন্দুরাও কাউকে কোনো সুযোগ দেবে না যে, কেউ তাদের ভুল বোঝাবে। কেউ যেন তাদের ভুল বুঝিয়ে দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে নামিয়ে দিতে না পারে! এ বিষয়ে সবাই ওয়াদাবদ্ধ হবে এবং সর্বোচ্চ সতর্ক থাকবে। তদ্রƒপ অন্যান্য ধর্মের লোকদের ক্ষেত্রেও একই কথা। মুসলিম-অমুসলিম সকল ধর্মের লোকেরা ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, আমরা সবাই মিলে দেশের

হেফাজত করব এবং দেশের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রের আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করব। কোনো ষড়যন্ত্রকে কোনো প্রশ্রয় দেব না, ইনশাআল্লাহ!

এই ধরনের ঐক্য ইসলাম সমর্থন করে। হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের একটা ঐক্য গঠন করেছেন। সেখানে মুসলিমদের সঙ্গে মদীনার ইহুদীরাও ছিল। হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার কিছুদিন পরেই এই ঐক্যটা হয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ মদীনা সনদে রয়েছে। সে ঐক্যের মধ্যে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না; বরং মদীনা সনদে ধর্মনিরপেক্ষতার স্পষ্ট বিপরীত বিভিন্ন দফা রয়েছে।

দেখুন :

دستور المدينة المنورة والدستور الأمريكي والبريطاني والأوروبي :دراسة توثيقية تحليلية مقارنة، تأليف الدكتور حسن محي الدين القادري

ঐক্যের ভুল ব্যবহার অনেক বড় অন্যায়

আবারো বলছি, এই ঐক্য আপন জায়গায় ঠিক আছে। তবে এই ঐক্যের ভুল ব্যবহার অনেক বড় অন্যায়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে হারাম ও কুফর।

ঐক্যের ভুল ব্যবহার বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন একটা ভুল ব্যবহার হল, `হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই!`

রাষ্ট্রের হেফাজত ও নিরাপত্তার বিষয়ে দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই এক— একথার অর্থ কি— নাউযুবিল্লাহ, ধর্মও সবার এক? সুতরাং সেখানে `হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই`— একথা কেন আসবে? এটি ভুল কথা; বরং মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই! হাঁ, সবাই যেহেতু আদম-সন্তান, তাই রক্ত হিসেবে সবাই ভাই হতে পারে! এক বাবার দুই ছেলের একজন মুসলিম আরেকজন হিন্দু, তারা পরস্পর ভাই নয় কি? সুতরাং ওই হিসেবে ভাই ভাই হতে পারে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, আদর্শ ও চিন্তা চেতনাগতভাবে ভাই ভাই হয় কীভাবে? সেটি কখনোই সম্ভব নয়।

মোটকথা, প্রত্যেকটা জিনিসকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। নতুবা ঈমান হেফাজত বড় মুশকিল হয়ে যাবে। দেখুন, দেশের হেফাজতের ব্যাপারে যেমন কোনো আপস চলে না, ঈমান হেফাজতের ব্যাপারেও কোনো আপস চলে না। বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝতে হবে। দেশের

হেফাজতের ক্ষেত্রে আমরা সবাই এক, কিন্তু নিজেদের ঈমান-আকীদা, আমল ও আদর্শে আমরা অটল-অবিচল। এক্ষেত্রে কারো সঙ্গে কোনো আপস হবে না।

তদ্রƒপ দেশের হেফাজতের জন্য আন্তঃধর্মীয় ঐক্য প্রসঙ্গে কেউ এসে যদি এটাও বলে যে, `ধর্ম যার যার, উৎসব সবার!` তার কথা সঠিক তো নয়ই; বরং গোমরাহীমূলক ও কুফুরী কথা।

আচ্ছা, আপনি যে ঐক্যের চিন্তা করছেন, সেটি ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তো সম্ভব। তাহলে উৎসবকে এক বানাবার দরকারটা কী? আপনি নিজেই বললেন, 'ধর্ম যার যার...; তো ধর্ম আলাদা হওয়ার পরও তো ঐক্যটা হচ্ছে! তাহলে `উৎসব`কে এক বানানোর দরকার কী? বরং ধর্ম যার যার, উৎসবও তার তার! তথাপি একটা বিশেষ ইস্যুতে সবার ঐক্য। বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে সবাই এক, বাংলাদেশের হেফাজতের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ এবং ওয়াদাবদ্ধ। আমরা দেশের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের কোনো ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করব না এবং কাউকে এর সুযোগও দেব না— এটা হল ঐক্যের ইস্যু এবং এই ঐক্য যথাযথ।

কিন্তু এই ঐক্যের অর্থ কখনো এই নয় যে, আমার আকীদার মধ্যে আমি কোনো অংশ ছেড়ে দেব —নাউযুবিল্লাহ— অথবা হিন্দুদের বা অন্য কোনো ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনাগুলোর প্রতি মনের দুর্বলতা লালন করব বা প্রকাশ করব। তারা নিজেদের গণ্ডিতে তাদেরটা করুক, আখেরাতে আল্লাহর কাছে তাদের হিসাব তারা দেবে। কিন্তু আমাদের তো তাদের সেখানে দখল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মনোভাব যদি এমন হয় যে, হাঁ, সেটাও একটা কাজ এবং ভালো। সেটাও চলতে পারে। অথবা সব ধর্মের মূলকথা একই বা কাছাকাছি। এমন মনোভাব লালন করলে কি নিজের ঈমান থাকবে?

তাওহীদের উৎসব আর শিরকের উৎসব এক হয় কীভাবে?

বিষয়টা আমাদের কাছে সাফ হওয়া জরুরি। আরে ভাই, উৎসব তো সবার এক হতে পারে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন—

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهذَا عِيدُنَا.

সব জাতির উৎসব আছে, আমাদের উৎসব হল এই পবিত্র ঈদ। আমাদের দ্বীন পবিত্র, আমাদের উৎসবও পবিত্র। আমাদের উৎসব ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা। তাকবীরে তাশরীক দিয়ে শুরু হয়, যার মর্মকথা হল তাওহীদ। তাওহীদ দিয়ে শুরু হয়, তাওহীদ দিয়েই সমাপ্ত হয়। সুতরাং

শিরকের উৎসব আর তাওহীদের উৎসব এক হয় কীভাবে? যখন এক উৎসবে থাকে শিরক আরেক উৎসবে থাকে তাওহীদ, আপনি উৎসবকে এক বানাবেন কীভাবে?

এক উৎসবের মধ্যে কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত হয়। ঈদের নামাযেও তিলাওয়াত করা হয়—

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

[আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি! —সূরা ফাতেহা (০১) : ০৪]

ঈদের নামাযের মাসনূন কেরাতে সূরা আ'লা পড়া হয়; যাতে রয়েছে—

وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى.

[এবং নিজ প্রতিপালকের নাম নিয়েছে ও নামায পড়েছে। —সূরা আ`লা (৮৭) : ১৫]

মানে সকাল থেকে আল্লাহর যিকির করেছে, তাকবীরে তাশরীক পড়েছে— `আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা— ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ`।

তাকবীরে তাশরীক পড়তে পড়তে ঈদগাহে গিয়েছে। গিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করেছে। যার পুরোটাই খালেস ও নিখাদ ইবাদত।

সালাতের পরে দুআ ও প্রার্থনা করেছে, সেটিও কেবল একমাত্র আল্লাহর দরবারে।

তাছাড়া ঈদের নামাযের পরে আর জুমার নামাযের আগে যে খুতবাদুটো পাঠ করা হয়, সেখানেও সম্পূর্ণ তাওহীদের কথা—

نَحْمَدُه.

(আমরা আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করছি!)

وَنَسْتَعِيْنُه.

(আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি!)

وَنَسْتَغْفِرُه.

(তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি!)

وَنُؤْمِنُ بِه.

(তাঁর ওপরই ঈমান আনছি!)

وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ.

(তাঁর প্রতিই ভরসা করছি!)

এভাবে পুরো খুতবাই তাওহীদ। সুতরাং যে জাতির উৎসব পুরোটাই তাওহীদ আর অন্য জাতির উৎসব আগাগোড়া শিরক, সেখানে শিরকের উৎসব আর তাওহীদের উৎসব দুটো এক হবে কীভাবে? কাজেই এভাবে উদারতা দেখিয়ে বলে দেওয়া— ধর্ম যার যার, উৎসব সবার— এটি হতে পারে না। এমনকি এটি অন্য ধর্মের মধ্যেও নেই। যেসব ধর্মের কোনো দলীল নেই, গোড়া ও মূল নেই, বরং বানানো বা বিকৃত ধর্ম, তাদের ধর্মের মধ্যেও একথা নেই যে, উৎসব সবার!

ইসলামের সাথে সকল বাতিল ধর্মের মৌলিক পার্থক্য

একমাত্র ইসলাম দলীলের ধর্ম। ইসলাম সকল বাতিল ধর্মের বিরোধিতা করে কী বলে জানেন? সকল বাতিল ও বিকৃত ধর্মের বিরুদ্ধে ইসলামের বড় চ্যালেঞ্জ—

مَا اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ.

[আল্লাহ এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। —সূরা নাজম (৫৩) : ২৩]

কুরআন কারীমের আয়াত—

اِنْ هِیَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّیْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ یَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ مَا تَهْوَی الْاَنْفُسُ وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰی.

এগুলো কিছু নামমাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা রেখে নিয়েছ, আল্লাহ এর সপক্ষে কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। প্রকৃতপক্ষে তারা (অমুসলিমরা) কেবল ধারণা ও মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। অথচ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের কাছে এসে গিয়েছে পথনির্দেশ। —সূরা আননাজম (৫৩) : ২৩

অর্থাৎ, তাদের এত এত দেব-দেবী যে, নাম বলে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন— এসবই তোমাদের বানানো। এমন নাম, যার পেছনে কোনো বাস্তব কিছু নেই। একটা নাম যে রেখে দিয়েছে, অথচ তার পেছনে কোনো দলীল নেই।

মানুষ কোনো কিছুর নাম রাখে এজন্য যে, নাম কোনো কিছুকে বোঝায়। কেবল হিন্দু নয়, বরং পৃথিবীতে যত মুশরিক জাতি রয়েছে, তাদের যত উপাস্য রয়েছে, সবগুলো উপাস্যই কেবল নামসর্বস্ব। নামের ভেতরে কোনো বাস্তবতা নেই; বরং শূন্য। এগুলোর পক্ষে আল্লাহ তাআলার নিকট হতে কোনো দলীলই আসেনি, বরং তারা নিজেরা নিজেরা কাল্পনিকভাবে সবকিছু বানিয়ে নিয়েছে এবং একেকটা নাম ঠিক করেছে আর সেগুলোর উপাসনা করছে! ফলে তাদের যাবতীয় উপাসনা ও প্রার্থনা সবই বাতিল ও বিফল।

শিরকের একটি কুরআনী উপমা

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেন—

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ.

একমাত্র তা-ই `যথার্থ` দুআ, যা তাঁর দরবারে পেশ করা হয়।

অর্থাৎ, যে প্রার্থনা কাজে আসবে, সেটি একমাত্র ওই প্রার্থনা, যা একমাত্র আল্লাহর দরবারে করা হয়। যে প্রার্থনার হাত ওঠে আল্লাহর দরবারে, যে প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়, সেটাই দুআ এবং সেটাই কাজে আসবে। বাকি সবই বৃথা ও নিষ্ফল।

আল্লাহ ছাড়া যার কাছেই তুমি প্রার্থনার হাত ওঠাবে, তার অবস্থা কী? আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে বলেছেন—

وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ.

তাঁকে ছেড়ে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে কোনো সাড়া দেয় না। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে পানির দিকে দুহাত বাড়িয়ে আশা করে— তা আপনিই তার মুখে পৌঁছে যাবে, অথচ তা কখনো নিজে নিজে তার মুখে পৌঁছাতে পারে না। আর কাফেরদের ডাক কেবল বৃথাই যায়। —সূরা রা`দ (১৩) : ১৪

অর্থাৎ, কূপ থেকে পানি ওঠানোর জন্য হয় বালতি, রশি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয় অথবা আজকাল মানুষ পাম্প বা অন্য কোনো আধুনিক ব্যবস্থাপনায় ওঠায়। কিন্তু এক লোক কূপ থেকে পানি নিতে গিয়েছে, অথচ তার কাছে না আছে বালতি, না আছে রশি, আর না আধুনিক কোনো ব্যবস্থাপনা। কিছুই নেই। বরং সে কূপের পাড়ে বসে হাত লম্বা করে পানি কামনা করছে! এতে কি পানি এসে যাবে? তার হাতও পানি পর্যন্ত পৌঁছে না, পানিও ওপরের দিকে উথলে ওঠে না।

আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া মানুষের বানানো যত উপাস্য, তাদের কাছে প্রার্থনা করা এমন, যেমন কূপের পাড়ে বসে পানির জন্য হাত লম্বা করে দেওয়া। না তার হাত পানি পর্যন্ত যায় আর না পানি তার হাত পর্যন্ত আসে! সারাদিন বসে থেকেও এক ফোঁটা পানি পাবে না। গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনাও ঠিক এমনই। সারা জীবন উপাসনা করেও মৃত্যুর পর কিছুই পাবে না। প্রার্থনা করাও সম্পূর্ণ বৃথা ও বিফল।

কাজেই যাদের উপাসনা ও প্রার্থনা সবকিছু বৃথা ও অযথা এবং যার কোনো অস্তিত্ব নেই, বরং সবই বায়বীয় ও হাওয়া, তাদের উৎসব আর তাওহীদওয়ালাদের উৎসব এক হয় কীভাবে? তাদের উপাসনা আর তাওহীদওয়ালাদের ইবাদতে কোনো মিল হতে পারে? এজন্য মুমিনের হৃদয়ে অমুসলিমদের কোনো আচার-অনুষ্ঠান, তাদের ধর্মীয় কোনো নিদর্শনের প্রতি ন্যূনতম কোনো দুর্বলতা থাকতে পারে না। তাদের সকল কুফর-শিরকের প্রতি ঘৃণা থাকতেই হবে। তাওহীদ ও ঈমানের ওপর মজবুত থেকে কোনো জাতীয় বিষয়ে ঐক্য, সেটি ঠিক আছে। হতে পারে। কিন্তু এই ঐক্যের কারণে যদি নিজের দ্বীন-ঈমান, তাওহীদ, ইবাদত, নিজের আমল, শরীয়ত ও সুন্নতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ছাড় পোষণ করা হয় এবং অন্যদের প্রতি যদি ন্যূনতম দুর্বলতা আসতে থাকে বা ঈমান-আকীদার বিষয়ে আপস শুরু করা হয়, তবে তো ঈমানই শেষ! এটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এখন দেখবেন বর্তমান সরকার এবং দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অনেক বেশি হওয়ার কারণে এই ধরনের আন্তঃধর্মীয় সভা-

সমাবেশ, সেমিনার ও ঐক্যের ডাক আসতে থাকবে। সেগুলো যদি সঠিক পন্থায় হয়, তবে খুব ভালো এবং খুব প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, ঈমান ও তাওহীদ নিয়ে টান দিচ্ছে, তাহলে আমাদের মতো নির্বোধ আর কেউ নেই।

এধরনের ঐক্যের আরেকটি আত্মঘাতী অন্যায় ব্যবহার হচ্ছে— যে কোনো ধর্মের অনুসরণ করেই আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে, জান্নাত লাভ করা যাবে। এটি স্পষ্ট কুফরী বিশ্বাস। কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী কথা। নাজাত একমাত্র ইসলাম কবুল করে মুসলিম হওয়া এবং ইসলামী শরীয়ত গ্রহণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অমুসলিমদের বাধ্য করে মুসলিম বানানোর বিধান দেননি, অধিকারও দেননি। এর অর্থ এই নয় যে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অমুসলিম থাকার বৈধতা দিয়েছেন। বৈধতা একেবারেই দেননি। বরং ইসলাম কবুল করা সবার ওপর ফরয করেছেন। এই ফরয লঙ্ঘন করলে আল্লাহ তাআলা তাদের দুনিয়াতে ছাড় দিলেও আখেরাতে কোনো ছাড় দেবেন না। আখেরাতে জাহান্নামই হবে তাদের একমাত্র ঠিকানা।

দুনিয়াতে যদি তারা জুলুম না করে, তাহলে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা এবং তাদের সাথে সদাচারের বিধানও দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। কিন্তু কেউ যদি আন্তঃধর্মীয় ঐক্যের অর্থ এমন মনে করে যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মকে সহীহ মনে করে এবং সেগুলোর অনুসরণ বৈধ মনে করে, তাহলে এটা স্পষ্ট কুফুরী চিন্তা। এই ঐক্য তো শুধু জুলুম মুক্ত এবং ইনসাফপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য; কুফরের সমর্থনের জন্য নয়। নিজেদের ঈমান-আকীদা ও শরীয়ত-সুন্নতের ব্যাপারে শিথিলতা পোষণ করার জন্যও নয়।

আবার এটাও এক তামাশা যে, আজকাল অধিকার নিয়ে যত কথা সব সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের কেউ মাজলুম হলে এটাকে কোনো বিষয়ই মনে করা হয় না। অথচ ইসলামের শিক্ষা হল, মাজলুম যেই হোক, তার পাশে দাঁড়াও আর জালেম যেই হোক, তাকে জুলুমের ক্ষেত্রে কোনো সাহায্য করা যাবে না। বরং তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখতে হবে, জুলুমের শাস্তি দিতে হবে। এটাই হল তার সাহায্য।

নিরাপত্তা দানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা

সবচেয়ে বড় কথা হল, আমরা যদি নিজেদের ঈমান-আমলের নিরাপত্তা চাই, যদি দেশ ও দেশের সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তা চাই, যদি চাই আমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা, মনে রাখতে হবে, নিরাপত্তা দানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা!

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আসমায়ে হুসনা ও গুণবাচক নামগুলোর একটি হল `আলমু`মিন`।

আল্লাহর প্রতি আমরা ঈমান এনেছি বিধায় আমাদের নামও মুমিন। কিন্তু আল্লাহরও এক নাম আছে `মু`মিন`। সূরা হাশরের শেষে আছে—

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, সকলের রক্ষক, মহা ক্ষমতাবান, প্রতাপশালী, গৌরবান্বিত, তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। —সূরা হাশর (৫৯) : ২৩

মজার ব্যাপার হল, এখানে আল্লাহর দুটো তাৎপর্যপূর্ণ নাম একসঙ্গে! `আসসালাম` `আলমু`মিন`— অর্থাৎ শান্তিদাতা ও নিরাপত্তাদাতা। সালাম অর্থ শান্তিদাতা আর মু`মিন অর্থ আম্ন ও নিরাপত্তাদাতা।

নিরাপত্তা দানকারী আল্লাহ্ই সকল ইবাদত ও উপাসনার উপযুক্ত

অন্য জাতির কথা এখন আলোচনা করছি না; মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তাআলা কখন নিরাপত্তা দান করেন? উম্মতে মুসলিমা আল্লাহর পক্ষ থেকে আম্ন ও সালাম তথা শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই লাভ করবে, যখন আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো রাখবে।

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ، اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ، الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.

যেহেতু (আল্লাহ তাআলা) কুরাইশের লোকদের অভ্যস্ত করে দিয়েছেন; তাদের অভ্যস্ত করেছেন শীত ও গ্রীষ্মের সফরে, অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের মালিকের। যিনি তাদেরকে ক্ষুধার অবস্থায় আহার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন। —সূরা কুরাইশ

এই সূরায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, সমস্ত ভয় থেকে নিরাপত্তা দানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। ক্ষুধার্তকে আহার দানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

মক্কার কাফের-মুশরিকদের অন্যরা একটু সম্মান সমীহ করত এজন্য যে, এরা বাইতুল্লাহর পাশের লোক। বাইতুল্লাহর খেদমত করে। তাই অনেক বালা-মুসিবত থেকে কেবল বাইতুল্লাহর প্রতিবেশী হওয়ার কল্যাণে তারা বেঁচে যেত।

কথা তো সবার জন্যই। কিন্তু এখানে আল্লাহ তাআলা মক্কার মুশরিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ.

এই বাইতুল্লাহর বরকতে তোমরা নিরাপদে থাকছ, এই ঘরের মালিককে কি ভুলে গিয়েছ? যে ঘরের দোহাই দিয়ে তোমরা চল এবং বিভিন্ন মুসিবত থেকে বেঁচে যাও, এই ঘরের মালিককে কি ভুলে গিয়েছ? এই ঘরের রব ও কর্তা কে? সুতরাং একমাত্র সে রবেরই ইবাদত কর!

الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ.

ক্ষুধা যন্ত্রণায় তোমাদের দিন কাটত, তোমাদের পানাহারের ব্যবস্থা কে করে দিয়েছেন? রিযিকের ব্যবস্থা কে করে দিয়েছেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ!

এই বাইতুল্লাহর কল্যাণে তোমাদের রিযিকের মধ্যে কত বরকত!

وَ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সফরে যাবে, সেটা ইয়ামান হোক আর শাম, যেদিকে যাও, কত আশঙ্কা, কত বালা-মুসিবত! কখন যে কে কীভাবে শেষ করে দেয়! ভয়ে কেউ বের হতে চায় না। তখনও আল্লাহ তাআলা তোমাদের নিরাপত্তা দান করেছেন।

যে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেছেন, সকল ইবাদত ও উপাসনার মালিকও একমাত্র তিনি। কাজেই আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদত এবং তাঁর বিধানের বাস্তবায়ন করা আমাদের জন্য জরুরি।

আল্লাহর সবচেয়ে বড় বিধানগুলোর অন্যতম হল আল্লাহর বান্দাদের প্রতি কোনো জুলুম না করা এবং ইনসাফ নিশ্চিত করা।

'আমন' ও নিরাপত্তা লাভের উপায় ঈমান ও আমানত রক্ষা করা

আম্ন ও নিরাপত্তা যদি চাও, সালাম ও শান্তি যদি চাও— তার উপায় হল, ঈমান ও আমানত রক্ষা কর। আরবীতে ঈমান শব্দের মূল অক্ষর বা ধাতু `আম্ন`, আমানত শব্দের মূল ধাতুও কিন্তু `আম্ন`। অর্থাৎ আম্ন ও নিরাপত্তার সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে ঈমান ও আমানতের। দুনিয়াতে কেউ যদি আম্ন ও শান্তি চায়, তাকে অবশ্যই ঈমান গ্রহণ করতে হবে, ঈমান হেফাজত করতে হবে এবং আমানত পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে হবে। খেয়ানত ও জুলুম কোনোভাবেই করা যাবে না। ইনসাফ ও আমানত রক্ষা করতে হবে।

যে সমাজে জুলুম ও খেয়ানত বিরাজ করে সে সমাজে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা আসতে পারে না।

যখন একমাত্র আল্লাহকে ভয় পাবে...

প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আমরা চাই যে, কেবল সম্প্রীতি রক্ষা করা বা কারো প্রতি জুলুম না হওয়া নয়; বরং নাগরিকদের কেউ যেন একেবারে কোনো ধরনের কোনো ভয়ই না পায়! কাউকে ভয় না পায়। নাগরিকদের সবাই নির্ভয়ে দেশে থাকতে পারে এবং বসবাস করতে পারে!

সুবহানাল্লাহ! আসলে কাউকে ভয় পাবে না— এটি তখনই সম্ভব হবে, যখন একমাত্র আল্লাহকে ভয় পাবে! আল্লাহকে ভয় পেলেই কেবল এটি হাসিল হবে যে, কাউকে আর ভয় পেতে হবে না। কিন্তু আল্লাহকে যদি ভয় না করা হয়, তাহলে সবাইকে ভয় পেতে হবে। কোন্ সময় কোন্ জায়গা থেকে কে হামলা করে, আক্রমণ করে, কী করে না করে— এমন আশঙ্কা লেগেই থাকবে! এজন্য ভয় থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহকে ভয় করতে হবে।

কবি সত্য বলেছেন—

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

যে একটি সিজদা তোমার কাছে অতি কঠিন, সেটিই তোমাকে মুক্তি দেয় হাজার সিজদা থেকে

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও বিশ্বশান্তির পথ

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে বাড়তে থাকা ব্যবধান ঘোচানো, সভ্যতাগুলোর সঙ্ঘাত রোধ ও বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বের প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মানুষই তা সমর্থন করে। এই প্রয়োজন সামনে রেখে গত মার্চ মাসে খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ আবদুল্লাহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সংলাপের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ব্যাপারে তিনি মুসলিম ওলামায়ে কেরামের সাথে মতবিনিময় করে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য তাদের অনুমোদন নেন। তিনি জুন মাসে মক্কা মুয়াজ্জামায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এতে তিনি ইসলামি নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যান্য ধর্মের নেতার সাথে সংলাপ করেন। এই চিন্তাধারার ফলে জুলাই মাসে মাদ্রিদে আন্তর্জাতিক আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে সারা বিশ্বের ধর্মগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, সংলাপ ও সহযোগিতার ওপর জোর দেয়া হয়, যাতে বিশ্ব থেকে ও উগ্রপন্থার অবসান সম্ভব হয়। বিভিন্ন মহাদেশ থেকে আগত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা এ ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার প্রথম সুযোগ পান। দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে নিউইয়র্কে। এর শিরোনাম ছিল 'শান্তি এবং আন্তঃধর্ম ও সংস্কৃতি সংলাপ'। এটাও সৌদি আরবের বাদশাহ আবদুল্লাহর প্রচেষ্টার ফসল। এ সম্মেলন ১২ ও ১৩ নভেম্বর জাতিসঙ্ঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ৮০টি দেশ থেকে আগত দুই শতাধিক প্রতিনিধি ধর্ম ও সভ্যতাগুলোর মধ্যে বাড়তে থাকা সেই ব্যবধান ঘোচানোর ওপর জোর দেন, সভ্যতাগুলোর সঙ্ঘাতের কারণ হচ্ছে। এ উপলক্ষে ২০ জন রাষ্ট্রপ্রধান ভাষণ দেন। প্রত্যেক বক্তাই এ মর্মে জোর দেন যে, বিশ্বের প্রতিটি ধর্মই শান্তি ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। বেশির ভাগ মুসলিম বক্তা পাশ্চাত্যের নীতির সমালোচনা করে বলেন, তাদের অজ্ঞতাই ইসলামের সাথে অন্যায় আচরণের কারণ। তারা আরো বলেন, বিশ্বের ১৩০ কোটি মুসলমান প্রশ্ন করছে পাশ্চাত্য এক দিকে সাম্য, পরস্পরের সম্মানবোধ, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ও ধর্মগুলোর সম্মানের কথা বলছে। অন্য দিকে তারা দ্বিমুখী মানদণ্ডে কেন বিচার করছে? ইসলামের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অসহিষ্ণুতাই এ ক্ষেত্রে বড় প্রমাণ। তেমনি অন্য ধর্মের নেতারা তাদের ভাষণে এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, ইসলামি বিশ্বে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। তাদের বিশেষ ইঙ্গিত ছিল সৌদি আরবের দিকে। তারা অভিযোগ করেন, সেখানে অন্য ধর্মাবলম্বীদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই।

জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের যে হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে এমন দৃশ্য ইতঃপূর্বে দেখা যায়নি। আগে দেখা গেছে, সেখানে একে অপরের কড়া সমালোচনা করছেন কিংবা ভাষণের মাঝখানে ওয়াক আউট করছেন। কিন্তু এবার সব নেতা একে অপরের কথা মনোযোগের সাথে শুনেছেন এবং প্রভাবিত হয়েছেন। সৌদি বাদশাহ পৃথিবীর সব মানুষ ও দেশের প্রতি শান্তি, সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার বিস্তারে সহযোগিতার আহ্বান জানান এবং বলেন, সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের সব ধর্ম ও সভ্যতারই শত্রু। এ জন্য সব জাতিকে তা মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজ তার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন, তার এ প্রচেষ্টা সমগ্র বিশ্বের দাবিতে পরিণত হবে। আর এটারই এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। সম্মেলনের বিশেষ পর্ব ছিল ঐতিহাসিক নৈশভোজ। ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজ ও সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী দেশের নেতারা এতে একই ঘরে আহার গ্রহণ করেন। দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে সদস্য দেশগুলোর প্রতি জোর দেয়া হয় তারা যেন মানবাধিকারের সম্মান করেন এবং নাগরিকদেরকে তাদের ধর্ম ও বিশ্বাস লালনের অনুমতি দেন। সম্মেলনে ধর্মকে সন্ত্রাসবাদের কাজে ব্যবহারের তীব্র বিরোধিতা করা হয়।

জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব বান কি মুন এ উপলক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, এ সম্মেলনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের পরস্পর মতবিনিময় ও যৌথ কর্মসূচি গ্রহণের পথ সুগম হলো এবং এতে বিশ্বে আরো সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা পাওয়া যাবে। সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অসহিষ্ণুতা, উগ্রতা ও যুদ্ধ উন্মাদনার প্রতীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশও ভাষণ দেন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতিকে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর সাধারণ কর্মপন্থা রূপে সাব্যস্ত করেন। তার পক্ষ থেকে ধর্মীয় সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা ঠিক তেমনই ছিল, যেমন একটি হিংস্র বাঘের মুখে কোনো দুর্বল নিরীহ প্রাণীর টাটকা রক্ত লেগে আছে। আর সে শান্তির ওপর বক্তৃতা করছে। এ সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা হয়, যা সব ধর্মে সাধারণভাবে রয়েছে। ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রসারে ভীত, ইউরোপীয় দেশগুলোতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা বেড়ে চলেছে এবং বেশ ক'টি দেশ স্কুল, ইউনিভার্সিটি, অফিসসহ প্রকাশ্য স্থানে মহিলাদের মাথায় ওড়না পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, যা অসহিষ্ণুতার আলামত। ভারতে অনেক দিন ধরে মুসলমানদের সাথে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানদের হত্যার বেশ ক'টি ঘটনা ঘটেছে। যেমন গুজরাটে মুসলমানদের হত্যার ঘটনা। এখনো অধিকৃত কাশ্মীর ও আসামে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন ও বর্বরতা কমছে না। তা ছাড়া মুসলমানদের পরম সম্মানিত ব্যক্তিদের মর্যাদাহানির ধারা অব্যাহত রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননাকর কার্টুন প্রচার, গুয়ানতানামো ঘাঁটি ও আবুগারিব কারাগারে কুরআন মজিদের অমর্যাদা, মুসলমান বন্দীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন, ডক্টর আফিয়া সিদ্দিকীর সাথে নির্দয় ব্যবহার, চলচ্চিত্রে কুরআনুল কারিম ও ইসলামের

অবমাননা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভিডিও গেমস, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র হরণকারী কুখ্যাত সালমান রুশদিকে নাইট খেতাব দেয়া, ইরাকে পবিত্র স্থানগুলোর অসম্মান ইত্যাদি মিলিয়ে শত শত নয়, হাজার হাজার ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের নির্যাতন এবং শান্তি কামনা পরস্পরবিরোধী। বুশের নীতিগুলোই বিশ্বে চরমপন্থা বিস্তারের কারণ। যদি তার উগ্রপন্থার নীতি বহাল থাকে, তাহলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার বিস্তার কেবল কামনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য আরো প্রয়োজন কোনো ধর্মের পবিত্র ব্যক্তিত্বদের এবং সম্মানিত স্থানগুলোর অসম্মানকে আন্তর্জাতিক অপরাধ সাব্যস্ত করা। এ ধরনের ঘটনা থামানোর জন্য জাতিসঙ্ঘকে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে এবং স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের নামে এটাকে শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত করতে হবে। তাহলে এর পুনরাবৃত্তি ব হবে।

ধর্ম ও সভ্যতাগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু যদি তা থেকে অসহিষ্ণুতা জন্ম নেয়, তাহলে যুদ্ধ ও খুনখারাবির কারণ ঘটে।

এখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সামনে দু'টি পথ খোলা। তারা চাইলে সভ্যতাগুলোর মাঝখানে সমঝোতার সেতুবন রচনা করতে পারেন। কিংবা কঠোরতা ও পরস্পর ঘৃণার নীতি বহাল রাখতে পারেন। তারা বিশ্বের বিভিন্ন সমাজকে শান্তি ও পারস্পরিক মর্যাদা প্রদর্শন এবং ঘৃণা ও বিরূপ আচরণ দূর করার নীতি অবলম্বনে পথ প্রদর্শন করতে পারেন

•

উপসংহার

ইসলামে ধর্মীয় সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া ও সহযোগিতার ওপর জোর দেয়। ইসলামে এই নীতির মূলে রয়েছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা এবং একে অপরের উপাস্যকে গালি না দেওয়ার নির্দেশ, যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ

আল্লাহ্কে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না।

(সূরা আন'আম-১০৮)

এটি একটি শান্তিপূর্ণ ও বিবাদমুক্ত সমাজ তৈরির ভিত্তি স্থাপন করে।